ইসলামের দৃষ্টিতে - গণতন্ত্রের সংশয় সমূহ

আত্-তিবয়ান পাবলিকেশন্স

ইসলামের দৃষ্টিতে - গণতন্ত্রের সংশয় সমূহ

সূচীপত্র

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ **"যারা মনোযোগ সহকারে কথা (ভাল উপদেশ সমূহঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, ইসলামের একত্ববাদ, ইত্যাদি) শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম (আল্লাহ্র একক ইবাদত করা, তাঁর নিকট তওবা করা এবং তাগুতের সাথে কুফরী করা, ইত্যাদি) তা গ্রহণ করে, তাঁরাই হল আল্লাহ্র পক্ষ হতে হেদায়াত প্রাপ্ত এবং মানুষের মধ্যে তাঁরাই হল বোধশক্তি সম্পন্ন ।"** (সূরা যুমার ৩৯:১৮)

ভূমিকাঃ

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য। অতঃপর শান্তি বর্ষিত হোক নবী (সাঃ), তাঁর পরিবার বর্গের ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) এর উপর শেষ দিন পর্যন্ত।

সাম্প্রতিক ইন্টারনেটে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদন যোগ্যতা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিতর্ক দেখা গেছে আমাদের দ্বীনি ভাইদের মধ্যে। "ভোটের পক্ষ এবং বিপক্ষ" এবং "ভোট কেন? এবং কাকে ভোট দিব?" শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ - যার প্রত্যেকটির মধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এই প্রবন্ধগুলি ছাড়াও, গণতন্ত্র সম্পর্কিত এবং সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় সমূহের সাথে আপনাদের পরিচয়ের প্রয়োজন অনুভব করছি।

উত্থাপিত বিষয়গুলোর সমাধানের মানসে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কিছু ভুল দাবীর শুদ্ধতা আশা করছি। এছাড়াও উল্লেখিত দুটি প্রবন্ধে লেখকদ্বয়ের কিছু ভুলের এবং এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু সাধারণ বিষয়ের পরিশুদ্ধতার চেষ্টা করব। মুসলিমদের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরতে কিছু ভূমিকা সম্বলিত পয়েন্ট অবশ্যই তৈরী করা দরকার। প্রবন্ধের ধারাবাহিকতায় আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদনের বিরুদ্ধে কিছু দলিল ভিত্তিক বির্তকের অবতারণা করব।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত কুফর এবং সুস্পষ্ট শির্কের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy। Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos ও Cratus থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Cratus অর্থ 'পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে।

আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল-কিলালি বলেছেনঃ "সকল প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মূলে রয়েছে একটি কাল্পনিক মতবাদ যার কর্তৃত্ব জনগণের উপর আরোপ করে এবং এই কর্তৃত্ব থাকে জনগণের উপরে তার নেতৃত্বে। সংক্ষেপে জনগণের দ্বারা গঠিত সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মাধ্যমে তৈরী সমষ্টিই হল গণতন্ত্র"। (*মাওসু'আত আস্‌-সিয়াসাহঃ* ২য় খন্ড,পৃ:২৫৬)

অতএব গণতন্ত্র এমন একটা পদ্ধতি যার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং যা আল্লাহ্‌র ঐ অধিকারের বিপক্ষে আচরণ করতে শেখায়। এবং এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র পরিশুদ্ধ একটি ইবাদত হতে ফিরিয়ে শির্কের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করায়। অনেক ক্ষেত্রে এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **"এবং আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতেনিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন ।"** (সূরা রা'দ ১৩:৪১)

তিনি আরও বলেনঃ **"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?"** (সূরা শূরা ৪২:২১)

এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দিধায়ে তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে। এভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রতিনিধিত্ব পায় আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশগুলোর উপর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **"তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে ওরা অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট ।"** (সূরা ফুরকান ২৫:৪৩-৪৪)

অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল '*তাওয়াগীত*' এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হল আল্লাহ্‌র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা। যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই '*তাগুত*' বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **"আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা দাবী করে যে তারা বিশ্বাস করে আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা তাগুতের কাছে তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে এর(তাগুতের সাথে) কুফরী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল... ।"** (সূরা নিসা ৪:৬০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্‌র ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেয় তাহলে সেই হল '*তাগুত*'। এই কারণে যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল '*তাগুত*'।" (*আল-ফাতওয়া*, খন্ড-২৮, পৃ:২০০)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) শাসন পদ্ধতি ব্যতীত যারা অন্য কোন পদ্ধতিতে শাসন করে তারাই তাগুত। মানুষ আল্লাহ্‌র পাশাপাশি যাদের ইবাদত করে অথবা মানুষ যে ব্যক্তির ইবাদত করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যম মনে করে এদেরকেও তাগুত বলে বিবেচনা করা যায়। যদিও এক্ষেত্রে তারা নিশ্চিত নয় যে তারা আল্লাহ্‌র একক ইবাদত করছে না দ্বৈত ইবাদত করছে। সুতরাং এরাই হল *তাওয়াগীত* (তাগুতের বহু বচন) এবং যদি আপনি এই সকল তাগুতের প্রতি এবং এদের সাথে জনগণের শর্তাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, জনগণ আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে তাগুতের ইবাদতের দিকে, আল্লাহ্‌র শাসন হতে তাগুতের শাসনের দিকে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে তাগুতের আনুগত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে"। (*'ইলাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন*, খন্ড ২৮, পৃ:৫০)

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহঃ) বলেনঃ 'এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল (সাঃ) এর মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্ক। এতে কোন সন্দেহ নেই'। (*আদ্বওয়া আল-বাইয়ান*, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫)

এখন সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্র প্রত্যাদেশের বৈপরিত্যে ঘোষণা করে। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে লুক্বায়িত শির্কের ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন অনুভব এই মুহূর্তে আমরা করছি না।[১]

যদি পাঠকগণ শুরু হতে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত না হন তাহলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের রায় সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াদি সমৃদ্ধ কোন প্রবন্ধ অথবা বই পড়ুন। কেননা এই প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য শুধু মাত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। আমরা এই প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যাখ্যার সাথে সংমিশ্রন করে জটিলতর করতে চাচ্ছি না।

নির্বাচন পদ্ধতি এবং ভোটারদের উপর এর প্রয়োগ

নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জনগণের নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ততার উপর নির্ভরশীল যার ফলে এটা পরিষ্কার করা যায় কারা কাউন্সিলে অথবা সংসদে এই জনগণের প্রতিনিধিত্ব দান করে। এই নির্বাচন পদ্ধতি আরও প্রয়োজনীয় ক্ষমতাশীল দল, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। এই নির্বাচন পদ্ধতিটি জনগণের নেতা পছন্দের উপর গঠিত যারা তাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন এবং এর প্রয়োগ করবে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত। জনগণ যদি নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। যেহেতু কেউ কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ পাওয়া যাবে না যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে অথবা সরকারের নীতিমালার বাস্তবায়ন করবে।

---

[১] এমনকি "ভোটের পক্ষে ও বিপক্ষে" শীর্ষক বইয়ের লেখক নূন্যতম এই সত্য স্বীকার করেছেন যে, একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগদান করা অবশ্যই অননুমোদনযোগ্য। তার বইয়ের প্রথম ধাপে তিনি বলেছেন যে, "বর্তমান আধুনিক সময়ের অবস্থা ইসলাম থেকে অনেক দূরে। প্রকৃত পক্ষে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের নিকট যিনি পবিত্র, মহান এবং সর্বোচ্চ। তাই কেউ যদি এমন কোন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় প্রকৃত পক্ষে যার ভিত্তি মানব রচিত অথবা আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত শরীয়াহ্র সাথে সাংঘর্ষিক অথবা যা ইসলামিক শরীয়াহ্কে বাতিল বলে ঘোষণা করে, তাহলে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিম আলেমরা একমত যে সেই শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অননুমোদন যোগ্য।

আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-কিলালী বলেনঃ “তাই বুঝা যাচ্ছে যে, জনগণ যাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তারা তাদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে। বরং তারা এমন সব সাংসদের হাতে কর্তৃত্ব দান করে যাদেরকে তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে। (*মা'ওসুআ'ত আস-সিয়াসাহ*, ২য় খন্ড, পৃ:৭৫৭)

শেইখ আবু বাসির মুস্তফা হালিমাহ বলেনঃ ‘প্রথমতঃ যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে। অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ্ নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারনের ক্ষেত্রে যার ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল্লাহ্ নয়। এটাই হল কুফর, শির্ক এবং পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবেই দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন-কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একক ইলাহিয়্যাতে (একনিষ্ঠ ইবাদতে) শরীক করে।’ (*হুকুম আল ইসলাম ফী আদ্-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত-তা'দ্দুদিয়্যাহ আল-হিযবিয়্যাহ*, পৃ:২৮)

সুতরাং সত্য হল এটাই যে, সকল সংসদ সদস্য যারা সবাই অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচিত এবং যারা আইন প্রণয়নের জায়গায় বসে আছে তারা তাদের এই আল্লাহদ্রোহী কাজগুলো তখনি করতে পারে যখন জনগণ তাদেরকে ঐ অবস্থানে বসতে সাহায্য করে। এখন যদি আমরা বলি যে, আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঐ সাংসদরা কুফর এবং শির্ক করছে তাহলে যারা তাদেরকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করছে তাদেরকে আমরা কি বলব? এমনকি তারা এটাও জানছে যে, এই প্রার্থীরাই মানব রচিত আইনের পুনর্গঠন করবে তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে।

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ বলেনঃ ‘তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুতঃ তাদের পক্ষে শির্কের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজ হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শির্কের বাস্তবায়নের অধিকার দেয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

“ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে রব হিসাবে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দিতে পারে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর কি সে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?” (সূরা আলি ‘ইমরান ৩:৮০)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কেউ ফিরিশতা ও নবীগণকে ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করে তবে সে কাফির। তাহলে যারা সংসদ সদস্যদেরকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের অবস্থা কি? এই ভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেনঃ

“তুমি বল, হে কিতাবীগণ এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি, এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ্ ব্যতীত ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ না করি ।” (সূরা আলি ‘ইমরান ৩:৬৪)

অতএব, মানুষকে আল্লাহ্র পাশাপাশি রব সরূপে গ্রহণ করা হল কুফরী এবং বেঈমানী এবং এই কুফরীই হল সংসদ সদস্যদেরকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে জনগণ এই কুফরী ও শির্কে লিপ্ত হচ্ছে । (*আল-জামি ফী তালাব আল-ইলম আশ-শারীফ*, ১/১৫১-১৫২)

আবার কেউ যদি নিজে সরাসরি কুফরীর সাথে জড়িত না থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুফরীর পক্ষপাতিত্ব করে তাহলে নিম্মোক্ত নীতিমালার মধ্যে পরিগণিত হবে যে, ‘কুফরীর সমর্থন দেওয়াও কুফরী’ । কেননা যে ব্যক্তি জেনে শুনে মানুষকে কুফর অথবা শির্ক করতে সাহায্য অথবা সক্ষম করে ঐ একই রায় তার ক্ষেত্রেও যে রায় প্রযোজ্য ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজে শির্ক অথবা কুফর করলো । রায়টা আসলে আমার নিজের নয় আমরা যদি নিচের আয়াতটি দেখি তাহলে পরিষ্কার হবে যে আল্লাহ্ তা’আলা স্বয়ং এই রায় দিয়েছেন ।

“কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ন করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং একে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসবে না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে । মুনাফিক ও কাফির সকলকেই আল্লাহ্ জাহান্নামে একত্রিত করবেন ।” (সূরা নিসা ৪:১৪০)

এবং আশ-শাওকানী (রহঃ) বলেন, ‘তাঁর ভাষ্য- নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে **‘আপনি তাদের মতই হবেন’** - অন্য কথায়- আপনি যদি কাজটি করেন অথবা প্রতিরোধ না করেন তাহলে কুফরীর ক্ষেত্রে আপনি তাদের সমপর্যায়ের ।’ (*ফাত্হ আল-ক্বাদির*, ১ম খন্ড, পৃঃ৫২৭)

শেইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেনঃ “উক্ত আয়াতটির অর্থ একেবারে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক তাই । আয়াতটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র আয়াতগুলো শুনে বিশ্বাস না করে অথবা আয়াতগুলো নিয়ে মজা করে/ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এবং কেউ যদি জোর-জবরদস্তি ছাড়াই এ সকল লোকদের সাথে বসে যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করেছে অথবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে এবং তাদেরকে প্রতিরোধ না করে অথবা তাদেরকে ত্যাগ না করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের আলোচ্য বিষয় পরিবর্তন করছে তাহলে সেও তাদের মত একজন কাফির । এমন কি সে যদি তাদের কাজে অংশ গ্রহণ নাও করে কেননা তার নীরব সম্মতি প্রমাণ করে কুফরীর প্রতি তার সমর্থন । কুফরীর প্রতি মৌন সমর্থন থাকাও কুফরী ।

এই আয়াত এবং এই ধরনের যে আয়াতগুলো আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কেউ যদি কোন পাপ কর্মে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে যে পাপ কাজটি করেছে সে তার মতই বিবেচিত হবে যদিও একথা বলে যে সে মনে মনে পাপ কাজটিকে ঘৃণা করে ।তবুও এটা

গ্রহণযোগ্য না। কেননা বিচার সাধারণত করা হয় বাহ্যিক প্রকাশ ভঙ্গির উপর ভিত্তি করে। কেননা অন্তরের আভ্যন্তরিণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। তাই বাহ্যত যার মধ্যে কুফরী প্রতীয়মান হবে সেই কাফির বলে বিবেচিত হবে।" (*মাজমুআ'ত আত-তাওহীদ*, পৃ:৪৮)

অতএব, যে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে কুফরী সংগঠিত হওয়ার স্থানে এবং ঐ স্থান ত্যাগ করে না অথবা ঐ স্থানে কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থাও গ্রহণ করে না তার ক্ষেত্রে ঐ একই রায় যে রায় কুফরীকর্তার ক্ষেত্রে। যারা শির্‌ক ও কুফরকে সাহায্য করে অর্থাৎ সক্রিয় থেকে কাউকে নির্বাচিত করে যাতে তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে কি বা বলা যায়। মনে রাখতে হবে যে, এই ভোট দান পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেকটি সংসদ সদস্যকে শির্‌ক এবং কুফরী করতে দেয়ার একমাত্র উপায় কারণ ভোটার কর্তৃক নির্বাচনীয় সমর্থন ব্যতীত তারা ঐ বিশেষ স্থানে সমাসীন হতে পারে না।

আমরা যদি একবারের জন্যেও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় তার কার্যকলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শির্‌কের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। যারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্য কাউকে 'রব' বানায় বৈধ ও অবৈধ করার ব্যাপারে, বিধান দাতা হিসেবে এবং যারা সূর্য ও চন্দ্রকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি জীবনী শক্তি ও খাদ্য/ রিযিক দানকারী হিসেবে রব বানায় তাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? আল্লাহ্‌র কসম! তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে একই রায় প্রযোজ্য।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পক্ষে যোগদান সংক্রান্ত সংশয়গুলোর ব্যাপারে ফয়সালাঃ

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান করাকে অনুমোদন দেয় সত্যিকার অর্থে তারা পথভ্রষ্টতার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে যে, অনিবার্যভাবে শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ তারা পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে রয়েছে। আর কতক রয়েছে যারা ভুল ধারণা ও সন্দেহ বশতঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদানকে বৈধ মনে করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলো নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে খন্ডন করা হলঃ

১/ মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইউসুফ (আঃ)-এর যোগদান সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ **"রাজা বলিল ইউসুফকে আমার কাছে লইয়া আইস; আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর রাজা যখন তাঁহার সহিত কথা বলিল, তখন রাজা বলিল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস ভাজন হইলে। ইউসুফ বলিল, 'আমাকে দেশের ধন ভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক।' এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্ম পরায়নদের প্রতিফল নষ্ট করি না।"** (সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬)

তাই যারা ইউসুফ (আঃ)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে-এটা গ্রহণযোগ্য হবে না?

যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে কারাগারে ইউসুফ (আঃ) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

"বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।" (সূরা ইউসুফ **১২:৪০**)

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আঃ) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যেঃ **"বিধান দেবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই।"**

প্রথমতঃ যারা এই (১২:৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে তাদের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আঃ)-এর শরীআহ্ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই। বরং এই আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা বারিয়ে ছিলেন।

ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ "ইউসুফ (আঃ)-এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন"। (*জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই আল-কুরআন*, ৯/২১৭)

আল-বাঘাবী বলেনঃ "মুজাহিদ (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেছেনঃ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।"

আরও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল।

ইবনে জারীর আত-তাবারী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেনঃ রাজা, ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন।

এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ **এই ভাবে আমি ইউসুফ (আঃ)-কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।**

"... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন...", এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়ে ছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চুরান্ত।

আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আঃ) কাছে হস্তান্তর করা হয়।" এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেনঃ "যখন রাজা, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আঃ) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো। এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আঃ ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি রাজার উক্তিতে-যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায় বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে। রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো। এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই। (*আল-জামী'লি আহকাম আল-কুরআন*, খন্ড ৯/২১৫)

তাই এক্ষেত্রে যদি এইরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (১২:৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুক্ষীণ হবে এবং ভুল হবে। কেননা ইসলামের একটা নীতি হল, " যদি কোন সম্ভবনা/ সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

আরও বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ উসুলের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের শরীয়াহ আমাদের শরীআহ হিসেবে বিবেচিত যদি না তা আমাদের শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাই কেউ যদি কল্পনার বশীভূত হয়ে শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে বলে যে, ইউসুফ (আঃ) তাঁর উপর প্রদত্ত শরীআহ মানেননি তাহলে তাকে বলতে হবে যে, ইউসুফ (আঃ) যদি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীআহ মানতে হতো।

২/ নীতিমালাঃ দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতি

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ

ক) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া ।

খ) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া ।

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না ।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি। শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল ।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শির্ক (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর। এটা হবে ২৫% এলকোহল বাদ দিয়ে ৫০% এলকোহল গ্রহণ করার মতো ।

৩/ নীতিমালাঃ ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা

এই নীতি বা উসুলটিও পূর্বেও নীতির মতোই। এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী ।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্ক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায়। শেইখ আবু বাশির মুস্তাফা হালিমাহ, অপর এক শেখের (ডঃ সাফার আল হাওয়ালী রচিত “An open letter to George W Bush”) বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যেঃ উক্ত শেইখ (হাওয়ালী)

আমেরিকার মুসলিমদেরকে, বুশকে ভোট দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন। শেইখ হালিমাহ লিখেছেন, " আমার বক্তব্য হলোঃ এ শেখের কথাগুলো নানা কারণে বানোয়াট ও বর্জনীয়। তাদের ক্ষেত্রে আমেরিকার মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। গণতন্ত্র- যা আমেরিকাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাতে একমাত্র আক্বীদা ও শরীয়াতের বিভ্রান্তির দ্বারাই অংশগ্রহণ করা সম্ভব, এবং ফলাফল কখনোই প্রশংসা লাভ করতে পারে না ; আর এর থেকে যতই সুবিধা লাভ করা যাক না কেন- তা কখনোই অজুহাত হতে পারে না। আর এক্ষেত্রে এটা কিভাবে সম্ভব হয় যেখানে এটি শরীয়াহ ও এর নীতির বিরুদ্ধে। আর এ ব্যাপারটি আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। (ওয়াকাফাত মা আশ শাইল সাফার, পৃ:১৮)

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুনঃ এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।" (সূরা বাকারা ২:২১৯)

সেই সাথে আল্লাহ্ (সুবঃ) আরো বলেছেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর এসব নোংরা অপবিত্র, শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মা'য়িদা ৫:৯০)

ইবনে কাসির (রহঃ) প্রথমোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন," এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হযম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়া খেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ **"...কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।"** (সূরা বাকারা ২:২১৯)

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো শির্ক আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।

৪/ নীতিমালা ঃ আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল

“আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়”- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়।

আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। এই হাদীসটির অপব্যবহার আরো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এজন্য আমরা এব্যাপারে বিশদ আলোচনা তুলে ধরছি, ইন্‌শাআল্লাহ্।

প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রহঃ) বলেনঃ “গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্য খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী– যা আরেকটি অন্যায়। সুতরাং সে যদি সচেতন থাকে (ভুল পথের ব্যাপারে) তাহলে, যেন শরীয়াতের উপর অটল থাকে। কিন্তু সে যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে তাহলে তার উপর অজ্ঞতার গুনাহ বর্তাবে, কারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। তাছাড়া, শরীয়াত যেখানে ভালো কাজের (নিয়্যতের বিশুদ্ধতা) ব্যাপারেই এমন (সতর্ক), সেখানে খারাপ কাজ কিভাবে ভালোতে পরিণত হয়? এটাতো অসম্ভব। সত্যিকার অর্থে, যে জিনিসগুলো অন্তরে এমন ধারণার জন্ম দেয় তা হচ্ছে অন্তরের গোপন খেয়াল খুশী বা কামনা-বাসনা... ।”

এরপর তিনি আরো বলেছেনঃ “এর দ্বারা যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ ভাল নিয়্যতে খারাপ কাজ করে তাহলে তার কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে দ্বীনে নতুন হয় এবং ঐ ইলম অর্জনের সময় না পায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **“অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।”** (সূরা নাহ্ল ১৬:৪৩)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) আরও বলেছেনঃ “সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বাণীঃ *“প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল”*– তিনটি জিনিসের (ইবাদত, গুনাহ ও মুবাহ্) মধ্য শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহাত (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না। হ্যাঁ, নিয়্যতের একটি প্রভাব এ ক্ষেত্রে (গুনাহের ক্ষেত্রে) আছে; তা হলো খারাপ কাজের সাথে যদি (আরও) খারাপ নিয়্যত যুক্ত

করা হয় এবং এটা তার বোঝা বৃদ্ধি করে আর পরিণতি হয় চুড়ান্ত খারাপ– যা আমরা 'কিতাবুত তাওবা'-তে উল্লেখ করেছি।"(*ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন*, ৪/৩৮৮-৩৯১)

শেখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শেইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। শেইখ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ বলেনঃ "আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) যে উদ্বৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।" (*আল-জামি ফী তালাব আল ইলম আশ শারীফ*- ১/১৪৭-১৪৮)

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম!

৫/ নীতিমালাঃ ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা

গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলেন তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকেন। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করেন। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। [২]

ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। অর্থাৎ, কোন চোরের চুরি বন্ধ করতে তাকে হত্যা করা যাবে না বা কাউকে সুদ দেয়া থেকে বিরত রাখতে তার টাকা ছিনতাই করা যাবে না অথবা কারো পরিবারকে তার অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পরিবারের মানুষদেরকে অপহরণ করা যাবে না। এই সামান্য

[২] এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে তাঁদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

বিষয়টি বোঝা মোটেই কঠিন কিছু নয় যদি সে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার বিষয়টি বোঝে ।

এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা । শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেনঃ “এবং (ভালো কাজের)আদেশ ও (মন্দকাজের) নিষেধকারীরা যদি জানে যে এর প্রতিফলে ভালোর সাথে সাথে মিশ্রিত হয়ে কিছু মন্দও ঘটবে, তাহলে তাদের জন্য এটি করার অনুমতি নেই যতক্ষণ না তারা এর ফলাফলের (বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে নিশ্চিত হয় । যদি ভালো ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তবে তারা এটি চালিয়ে যাবে । আর যদি মন্দ ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তাহলে তাদের জন্য এটি করা নিষেধ, যদিও এর দ্বারা কিছুটা ভালো (ফলাফল) বিসর্জন দিতে হয় । এক্ষেত্রে এই ভালো কাজের আদেশ করা, যার পরিণতি খারাপ একটি খারাপ বা মুনকারে পরিণত হয় যা আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) অবাধ্যতা বৃদ্ধি করে ।”(*আল আমর বিল মারুফি ওয়াল-নাহিয়ু ’আন আল-মুনকার*, পৃঃ ২১)

ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেনঃ “সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ (সুবঃ) ও রাসূল (সাঃ) বেশী অপছন্দ করেছেন (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয় । যদিও আল্লাহ্ (সুবঃ) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন ।” (*ই’লাম আল-মুওয়াক্কীন*, খন্ড ৩, পৃঃ ৪)

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে । দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা । এক্ষেত্রে যদি আমরা ইরাকের মুসলিমদের উপর অত্যাচার কমানোর কথাও চিন্তা করি, তাহলেও কি আমরা শির্ককে বিনিময় হিসাবে ধরতে পারি । আল্লাহ্ বলেছেনঃ **“ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর ।”** (সূরা বাকারা ২:২১৭)

এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুবঃ) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায় । শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ “যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল ।”(*আল ফাতওয়া*-২৮/৩৫৫)

শেখ আলী আল-খুদাইর তাঁর “লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্” - এই সাক্ষ্য দানে আহবান” বইটিতে শেইখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ “আল-ফিৎনাহ হলো কুফর । সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াহ বিরোধী ।”

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না । এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে ।

৬/ নীতিমালাঃ নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল!

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারের ঃ

(১) দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়

(২) জীবনের জন্য আবশ্যকীয়

(৩) মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয়

(৪) রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয়

(৫) সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো জ্বিনা করা বা কোন মাহ্‌রাম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারে না যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়ত, শির্‌ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্‌ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইকরাহ (চুড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা শির্‌ক ও কুফরকে হালাল করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে পারি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেনঃ "নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে,(সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবঃ) বলেছেনঃ **"বলুনঃ আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।"** (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

এই বিষয়গুলো সকল শরীয়াতেই হারাম করা হয়েছে, আর এগুলোর ব্যাপারে সাবধান করতে আল্লাহ্ নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই এগুলো হালাল ছিল না, কঠিন সময়েও নয়। আর এ কারণেই এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়।

শেখ আলী আল খুদাইর, শেইখ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ **"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।"** (সূরা বাকারা ২:১৭৩)

সুতরাং এখানে 'অনন্যোপায়' অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয়।" তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেনঃ "এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা সেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে?! এ ধরনের তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- **"বেচাকেনা তো সুদের্‌ই মতো।"** (সূরা বাকারা ২:২৭৫)। [হিদায়াত আত-তারিক, পৃঃ১৫১]

শেখ আলী আল খুদাইর বলেছেনঃ "আমরা বলিঃ অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত জীব ভক্ষণের অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা, শির্কের সমাবেশে প্রবেশের অনুমতির দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ও তাগুত সরকারের সাথে জোট করা হয় 'দাওয়ার উপকারীতা'র নামে।" (*আল জামু ওয়াত তাজরিদ ফী শারহি কিতাব আত তাওহীদ*, পৃ:১২১)

৭/ নীতিমালাঃ জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য

এর আগের (৬ নং) পয়েন্টে আমরা এব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা শির্ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে সেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।

'আলা আদ্-দ্বীন আল-বুখারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী জবরদস্তি হলোঃ করো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় যা সে করতেও সক্ষম। তাই অন্য ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয় এবং জবরদস্তির বাস্তবায়নে তার সন্তুষ্টি দূরীভূত হয়।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, "এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।" (*নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ*, ২/৭)

সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 'স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'।

'ইক্‌রাহ'-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্‌র (রহঃ) বলেনঃ "ইকরাহ'র ৪টি শর্ত রয়েছেঃ

প্রথমতঃ যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে।

তৃতীয়তঃ তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না।

চতুর্থতঃ যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে। (ফাত্‌থ আল-বারি, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১)

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

জোর জবরদস্তি সংক্রান্ত একটি উল্লেখ্য বিষয়ঃ

বর্তমানে ইরাক ও অন্যান্য স্থানে আমাদের ভাই-বোনদের ওপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চলছে, তাতে তারা অনেকেই 'ইকরাহ'-এর পরিস্থিতিতে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থা ইকরাহ-র সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর আওতায় পড়ে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে আল্লাহ্‌র শত্রুরা (আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুন) আমাদের ভাইবোনদের নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে এবং এখনও করছে। এসব অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা কেউ পড়লে সে অবশ্যই বলবে যে, তাদেরকে ঐসব অবস্থায় শির্‌ক ও কুফর করতে বাধ্য করলে তাদের কিছুই করার ছিল না।

কিন্তু, বাস্তবতা হলো যে, ইরাকের ঐসব নির্যাতিত ভাইবোনরা নয় বরং সেই সব মানুষ নির্বাচনের দিকে ডাকছে যারা মোটামুটি আরামেই আছেন। আর একারণেই এসব মানুষের ক্ষেত্রে ইকরাহ'র এই নীতি প্রয়োগ করা যায় না। পৃথিবীর এক অংশের মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেটিকে তারা নিজেদের কুফর বা শির্‌কের জন্য অজুহাত করতে পারেন না। এদেরকে কোন অবস্থাতেই নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে না, আর এ অবস্থাকে নিপীড়ন বলা যাবে না।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায়ঃ

যারা এই শির্‌কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদন যোগ্য নয়, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলমান ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়। এটা হলো একটি দিক। তা ছাড়াও এটা স্পষ্ট যে তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষতির পরিমান কমিয়ে সমাজে কিছু ভাল আনয়েনের উদ্দেশ্য। যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না।

অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্‌ক বা কুফর করলেই সেটা ক্ষমা করা হবে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। তবে যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি যায়েয করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফির বলাটা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা। যতক্ষণ না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এসকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে তাকফির করতে পারি না।

যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসী বলেনঃ "এর মাঝে কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে ডেকে আনা হয় ঐসব ব্যানার বা পোস্টারের সামনে যেখানে লেখা থাকে, **"ইসলামই একমাত্র সমাধান"** (অর্থাৎ ইসলামী দলে ভোট দিন) অথবা এ ধরণেরই কোন শ্লোগান যা দ্বারা মুশরিক শাসকরা জনগনকে বিভ্রান্ত করে থাকে। অতঃপর তারা তাদেরকে ভোট দেয় এবং নির্বাচিত করে কারণ তারা ইসলামকে ভালোবাসে এবং শরীয়তের অনুগত থাকতে চায়; তাছাড়া এই শির্কের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই বা শির্কের গভীরে প্রবেশ করার ঐরূপ ইচ্ছাও তাদের নেই যেরূপ রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যারা ইসলামের বেশ কিছু আইন নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। সুতরাং যারা সরাসরী আইন প্রণয়নের অধিকার নেয়নি বা কুফর আইনের সম্মানে শপথ বাক্য পাঠ করেনি বা এর কাছে বিচার প্রার্থনা করেনি অথবা কথা ও কাজে এমন কোন কুফর করেনি যা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ করে থাকে; তাদের (তাকফির করার) ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, এ কথা সবারই জানা যে একজন ভোটার কখনও সরাসরী এসব কাজ করে না। বরং সে শুধু তার পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে।"

তিনি আরও বলেনঃ "আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটার) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। এর পরও যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল। সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্যসমুহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবে না, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত জানে না তার কাছে, মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। কারণ, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; আর তাছাড়া 'গণতন্ত্র', 'পার্লামেন্ট' গুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের দানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তি সমূহ দূর করা।

উপসংহার ঃ

হে পাঠক! কোন সন্দেহ নাই মুসলিমরা আজ ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। আজ আমাদেরই ভাই-বোনদের উপর সংঘটিত হয়ে চলছে পৃথিবীর নৃশংসতম নির্যাতন, গণহত্যা; যা দেখে চোখের পানি ঝড়ছে আর হৃদয়ে আগুন জ্বলছে। এই বর্তমান অবস্থা দেখেও যদি কারো অন্তর নাড়া না দেয় তাহলে সে যেন তার ঈমানের ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করে আর তার মৃত অন্তরকে পরীক্ষা করে দেখে।

একই সাথে, আমরা আমাদের ভাইবোনদের সাবধান করে দিতে চাই শয়তানের চক্রান্ত থেকে যে সর্বান্তকভাবে আমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। উত্তম আমলের নামে, ইসলামের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে তারা আমাদের শির্কের মাঝে প্রবেশ করাতে সদাতৎপর। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডই নিষিদ্ধ নয়। যদি এগুলো শির্ক বা কুফরের আওতায় না পড়ে এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নত অনুযায়ী পালন করা হয় তাহলে কোন বাধা নেই। যেমন, আলোচনা সভা, সমাবেশ, প্রচারণা, ইত্যাদি কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ড যেগুলো শরীয়তের কোন নিষেধ নেই।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের প্রয়াসটি ছিল সাম্প্রতিক কালে উত্থিত এই বিতর্ককে ঘিরে যা বেশ কিছু লেখকের প্রবন্ধকে ঘিরে বেশ জমে উঠেছে। আমরা শুধু চেয়েছি, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং তাদের কিছু সংশয়ের জবাব দিতে এবং তাদের যুক্তি তর্কাদীগুলো খণ্ঠন করতে।

আমাদের এই প্রয়াসের মাঝে যদি সঠিক কিছু থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় আল্লাহ্ (সুবঃ)-এর তরফ থেকে আর এর ভেতর যদি কোন ভুল বা সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে তা আমাদের এবং শয়তানের থেকে, আমরা তার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের উপর।